গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

পথ হারানো পথিকের মতোই সকল কর্মী মানুষরা আজ দিশাহারা। কর্মই জীবনের ধর্ম। অথচ এই দেশের তথা সমাজের বৃহত্তর শ্রমজীবি গোষ্ঠী আজ প্রায় কর্মহারা। প্রকৃতির নানারকম রোষ আর স্বার্থান্বেষীদের কোপের কবলে পড়ে আজ বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি যখন সমভাবে অগ্রসর হবে, তখনি একটা বেকারত্বহীন সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। আর সেইদিনই শ্রমিক শ্রেনীর মুখে প্রকৃত জয়ের হাসি উদ্ভাসিত হবে।

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ১২

মে ২০২১

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, ডঃ মালা মুখার্জী, অমিত নাগ, সংহিতা ভট্টাচার্য্য, দালান জাহান, দোলা ভট্টাচার্য, রিয়া মিত্র এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

শ্রমিক সংখ্যা

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

সময় যত সামনের দিকে এগিয়ে চলছে, আমরা তত বেশি গৃহবন্দি হয়ে পড়ছি। হয়তো আগামী দিনগুলোতে যাতে একইভাবে ভোরের সূর্যোদয় দেখতে পাই, তার জন্যই নিরুপায় হয়ে আমাদের এই বন্দি জীবনকেই আপন করে নিতে হচ্ছে! 'অমল'-এর মতোই বাইরের প্রকৃতিকে দেখার জন্য সবার মনটা ছটফট করছে। এই প্রকৃতিকে তথা স্বাভাবিক জীবনকে ফিরে পেতে হলে, আমাদেরই হতে হবে আরও বেশি সচেতন ও সজাগ। সামাজিক বিধিনিষেধ মান্য করার পাশপাশি পরিবেশ সচেতনতাও বাড়াতে হবে। অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ করা, উপকারী কীট-পতঙ্গদের, পশুপাখিদের সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় থাকলে বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের প্রকোপও হ্রাস পায়। তাই সকলে সচেতন হন, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই থাকে। শুধু সঠিক পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই 'দশে মিলে করি কাজ হার-ই জিতি নাহি লাজ।'

(বি.দ্র. বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাৎ লকডাউন, অর্থনৈতিক অবনতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক প্রভৃতি কারণে আমাদের 'গুঞ্জন' ই-পত্রিকা যথা সময় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আপনাদের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় আপনাদের প্রিয় 'গুঞ্জন' আরও এগিয়ে যাবে।) ■

(সবাই সুস্থ থাকুন এবং ভালো থাকুন)

বিনীতা —রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

দফতর থেকে

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা বন্ধুরা,

দেখতে দেখতে যেমন শিশুরা চোখের সামনেই বড় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই এই মে-২০২১ সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই আপনাদের প্রিয় ‘গুঞ্জন’ ই-পত্রিকাটি দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। অর্থাৎ জুন-২০২১ থেকে আমাদের তৃতীয় বর্ষের যাত্রা শুরু হতে চলেছে। তাই আজ এই আনন্দের দিনে বারে বারে তাঁদের সবার কথা মনে পড়ছে, যাঁরা নেপথ্যে থেকেও গত দু’বছর ধরে সক্রিয়ভাবে, ‘গুঞ্জন’-কে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, যাঁরা স্বেচ্ছায় এই ই-পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসারের গুরু দায়িত্বভার বহন করেছেন, যাঁরা তাঁদের অমূল্য রচনাশৈলীতে ‘গুঞ্জন’-এর পাতাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছেন, যাঁরা একটানা পৃষ্ঠপোষকতা করে আমাদের বাধিত করেছেন এবং যাঁরা বাঙালি না হয়েও এই বাংলা ই-পত্রিকাটির প্রতিটি পাতা, নিজেদের দক্ষতা দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন এবং ই-মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন... আমাদের এই সাফল্যের অন্তরালে তাঁদের যে অবদান রয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই এই শুভ অবসরে ‘গুঞ্জন’-এর কার্যকারী সমিতির তরফ থেকে আমরা আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এভাবেই আগামী দিনগুলোতে আমাদের পাশে থাকুন, সাথে থাকুন।

বিনীত

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, শুভ্র নাগ, প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কিংবদন্তি শ্রী সত্যজিৎ রায় শুধু একশো নন একাই একশো। বাংলা চলচিত্র, চিত্র ও সাহিত্য জগতে উনি হলেন আমাদের অন্যতম সাংস্কৃতিক বৈভব। উনি শুধু স্রষ্টা নন, উনি ওনার সমস্ত সাংস্কৃতিক সৃষ্টির মাধ্যমে দিয়ে গেছেন নব দিগন্তের সন্ধান। ওনার অবিস্মরণীয় শিল্পকর্ম, অসীম প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি ভাষায় অবর্ণনীয়। আমরা শুধু শত নয়, শত সহস্র বছর ধরে মান্যবর শ্রী সত্যজিৎ রায় এবং ওনার রেখে যাওয়া শিক্ষণীয় সৃষ্টি-কর্মের কাছে ঋণী হয়ে থাকবো...

শ্রী সত্যজিৎ রায়

জন্মঃ ২ মে, ১৯২১ প্রয়াণঃ ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ জীব প্রেম...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

অব্যক্ত

সময় কাহন

প্রগতি দাস

রাতের স্তব্ধতা জানে
সকাল অনন্য;
প্রেম বঞ্চিত কালো মেয়ে
কবিতায় লাবণ্য।

বেকারের কাহিনী
দৈনিক খবরে;
যোগ্যতা চাপা পড়ে
অর্থের গভীরে।

বন্ধ কারখানা
টান পড়ে ভাতে;
শ্রমে ভেদ হয় না
ভাগ হয় জাতে।

মুঠোফোনে জীবন
সাজানো সুন্দর;
ক্ষয়ে যাওয়া মন
পোড়ে নিরন্তর।

রোজ কত ঘটনা
এড়িয়ে যায় চোখ;
কে কার খবর রাখে?
মুখ আড়াল করেছে মুখোশ। ■

কলকাতার মিছিল

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সিগারেটের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে

কলকাতার সব সমস্যা,

মিছিলের ল্যাজ ধরে, রাজপথে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

মিছিল দণ্ডায়মান, সামনের সিগনাল লাল

অনেক বারুদ ভস্ম হল,

চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে স্লোগানের ইন্দ্রজাল।

অসীম স্তিমিত প্রজ্ঞার সীমিত প্রস্ফুরণ

যানজটে ওষ্ঠাগত সাধারণ প্রাণ,

তার মাঝে অবিরাম বয়ে চলে বিষাক্ত সমীরন।

অতীতের স্মৃতি আর অফুরান আশ্বাসন

আশাবীদ মানুষকে ঘরছাড়া করে,

বিনে পয়সায় হয়ে যায় কলকাতার অনন্ত দর্শন।

যুগে যুগে বদলেছে কলকাতার মনোহারি রং

এখানে দূর গাঁয়ের অগণিত মানুষ,

জীবনে অন্তত একবার সেজে গেছে সড়কের সঙ।

আর অজস্র হতভাগ্য মানুষের নিরুপায় হাহাকার বেচে

নির্লজ্জ, ভন্ড কিছু জোঁক,

চিরকালই দিব্যি কাটিয়ে যায় মহানগরীতে নেচে নেচে। ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

চতুর্থ পর্যায় (৩)

দেহ সম্পর্কে কর্তৃত্বাভিমান বা মমত্ত্ববোধ সরিয়ে সেই জায়গায় দেবত্ব ভাবনা করাই ন্যাসের তাৎপর্য। এবং দেবত্বভাব এলে অন্য কোন তুচ্ছতা স্পর্শ করতে পারে না। যাঁরা তা পারেন তাঁদেরই সন্ন্যাসী বলে। সেটা সংসারে থেকেও করা যায়, তবে তাঁদের গৃহীসন্ন্যাসী বলে। এই সন্ন্যাসীদের দর্শন অনেকেই পেয়েছি। আবার উল্টোটাও দেখেছি। শুধু গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না। তাই অবাক না হয়ে এগিয়ে চলেছি।

আজ ২৫শে অক্টোবর ২০১৬। কুয়াশার সাদা চাদর সমস্ত দিক ঢেকে রেখেছে। একটা বড় গাছের নীচে দেখলাম, কিছু পরিক্রমাকারী শুয়ে আছে। ওরাও ওই মন্দিরের পূজারীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটিয়েছে। বড় প্রাচীন গাছকে এখানে চবুতরা বলে। নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলেছি। কুয়াশার জন্য সূর্যের আলো ঠিক মতো আসছে না। এরই মধ্যে আমরা চারজন পরিক্রমা-কারী সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে নর্মদা পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়েছি। নদীর চড়ে নেমে এলাম যদি কিছুটা আলো পাওয়া যায়। কুয়াশার জন্য দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডানদিকে

নমামি দেবী নর্মদে

স্বচ্ছতোয়া কলনাদিনী পুণ্য সলিলা নর্মদা আর বামদিকে সাদা বিশাল মন্দির দেখলাম। নীলকণ্ঠ শিবের মন্দির দর্শন হলো। সকাল দশটা বেজে গেছে। প্রায় চার ঘন্টা বালির চড়ে হেঁটে চলেছি। কিছু দূরে এসে দেখলাম সক্কা নদী নর্মদায় মিশেছে। দিব্যানন্দজী বললেন, ওপাড়ে যেতে হবে। কিন্তু জলের গভীরতা, কাদা আছে কিনা, থাকলেও কি রকম আছে তা কিছুই অনুমান করতে পারছি না। কে যেন বলে, 'মহারাজ আপনারা কি ওপাড়ে যাবেন?' তাকিয়ে দেখি একটি ২৪/২৫ বছরের সুঠাম চেহারার ছেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম ছেলেটিও ওপাড়ে যাবে। সে বললো, 'আমার সঙ্গে আসুন।' আমরা চারজন ওকে অনুসরণ করলাম।

"আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি যে পথ চিনি না।" সত্যি আমার হাত ধরে নদী পাড় করে দিলো ছেলেটি। এতো পাঁক-কাদা, এতো কষ্ট করে পেড়োলাম মনে হলো সত্যি জীবন নদীর ওপারেই সংসার যন্ত্রনা শেষ করে চলে এলাম। হেঁটেই নর্মদা পরিক্রমা করবো তাই চলার শেষ নেই। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন সড়ক যোজনায় রাস্তা তৈরী হচ্ছে। খুব ধুলো আর পাথর পড়ে আছে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একটা দোকানে চা আর বিস্কুট খাওয়ার অছিলায় সামান্য বিশ্রাম নেওয়া হলো। দুপুর সাড়ে এগারোটা। কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের রোষানলে পড়েছি। কপাল থেকে ঘাম চশমার উপর পড়ছে। আবছা হয়ে যাচ্ছে চশমার কাঁচ

সঙ্গে ধুলোর জন্য নাক ঢেকে চলতে হচ্ছে। দু-একবার হোঁচটও খেলাম। আমাদের এই অবস্থাটা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সেই ভাবে কোন বড় গাছও নেই, যার তলায় একটু বসবো। প্রায় সাড়ে বারোটা। কোন মন্দির বা আশ্রমের সন্ধান পাইনি এখনো পর্যন্ত। খুব চড়াই পথ।

হঠাৎ দূরে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অনেক দূর। ঐ দিক লক্ষ্য করে দুপুর দেড়টা নাগাদ পৌছালাম মন্দিরে।

নর্মদা পাড়ে খুব বড় মন্দির এখনো কাজ চলছে। 'নর্মদে হর' বলে দাঁড়াতেই বেড়িয়ে এলেন ভবানী প্রসাদ জি। রোগা, লম্বা, খুব বড় বড় সাদা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। সাদা পোশাক। শুভ্র বসনা, রজনীগন্ধার মতো আকর্ণ বিস্তৃত ফোকলা হাসি হেসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'আপনারা স্নান করে বিশ্রাম করুন আমি ভোজন প্রসাদ তৈরী করে দিচ্ছি।'

– তথাস্তু।

গ্রামটির নাম শকলপুর। মার্তণ্ড ভৈরবের তেজের সামনে আমার মতো সামান্য তপোবলহীন এক পরিক্রমাবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান যে ঝলসে যাবো সেটাই স্বাভাবিক। তাই খুব চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু আমরা তো রেবা নামের কবচ মালা ধারণ করেছি। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সাড়ে তিনটের সময় 'নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে নদীর চড়ে এসে নামলাম। ভরা পেট, তপ্ত বালির উপর দিয়ে ভারী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হেঁটে চলেছি। কি

পরিমাণ কষ্ট সেটা হারে হারে বুঝতে পারছি। এলাম সোনাদহ গ্রামে। এখানে কোনো থাকার জায়গা নেই। বেলাও বেড়ে যাচ্ছে, তাই এগিয়ে চলেছি।

সন্ধ্যে ছ'টার দিকে এলাম পিপারপানি গ্রামে। শুনলাম মা নর্মদার মন্দির আছে। কিন্তু একি! আমাদের চারজনকে দেখেই মহারাজের মুখ বাংলার পাঁচের মতো হয়ে গেল। খাওয়ার জন্য জল চাইতে কল দেখিয়ে দিলেন। বুঝলাম আজ কি হতে চলেছে। সময় নষ্ট না করে কলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আজ রাতের মতো মন্দিরের বারান্দাতেই আসন পাতলাম। বালির উপর দিয়ে কুড়ি কিলোমিটারের বেশি হেঁটে এসেছি। মায়ের আরতি করার পর আর সময় নষ্ট না করে শুয়ে পরলাম। কারণ বৃথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তিক্ততাই বাড়ে। সেই অভিজ্ঞতা আমাদের তো আছেই।

মহাগভীর-নীরপূর পাপধূত ভূতলং
ধ্বনৎসমস্ত-পাতকারি-দারিতাপদাচলম্।
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকন্ডুসূনুহর্মদে
ত্বদীয় পাদ পঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে।।

নর্মদে হর। ...ক্রমশ ■

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(১০)

অনেকটা রাত হয়ে গেছে, বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পিকু খুশবুর হাত দু'টো চেপে ধরে সবটা বলতে অনুরোধ করল। পিকু জানে তার হাতে শুধু আজ রাতটাই আছে। বেশি দেরি হয়ে গেলে, অকালে অনেকেই প্রাণ হারাবে। অনেকক্ষণ পর খুশবুর নির্বাক স্বর সবাক হল।

"সেই ছোটবেলায়... প্রতিদিনের মতোই আমি তোমার জন্য স্কুলে সেকেন্ড বেঞ্চে জায়গা রাখতাম, কিন্তু গোটা একটা মাস কেটে গেল, তুমি আর স্কুলে এলেনা। খুব মন খারাপ লাগছিল। মনে অনেক প্রশ্নের ভিড় জমতে শুরু করেছিল। আর প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য একদিন স্কুল ফেরত মিতালী মাসির কাছে বায়ানা ধরলাম তোমার বাড়ি যাবো। অনেক বায়না করার পর মিতালী মাসি আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হল। কিন্তু গিয়ে জানতে পারলাম, তোমরা ওখান থেকে চলে গিয়েছিলে অন্য কোথাও। আর কোনদিন ওখানে ফিরে আসবে না। সেদিন বাড়ি গিয়ে খুব কেঁদেছিলাম। কিন্তু সময় তো থমকে থাকে

না, তাই সময়ের সাথে সাথে সেই রোজকার বাবা–মার ঝগড়া, একাকীত্ব সব কিছু নিয়ে কবে যেন বড়ো হয়ে গেলাম। তবে পিকু মনে মনে এটা কোথাও বিশ্বাস ছিল, হয়তো আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করব।

আমি কলেজে পড়াকালীন ইমতিয়াজের সাথে বন্ধুত্ব হয়। সেই বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে ভালবাসার রঙ লাগলো। এদিকে বাড়ির অশান্তি বেড়েই চলছিল। কেউ আমার চাওয়া-পাওয়ার কথা ভাবতই না। তাই তখন যে ভালবাসার হাতটা সবচেয়ে বেশি আপন মনে হয়েছিল, সেই ইমতিয়াজের হাত ধরে বাড়ি ছাড়লাম।" এই বলে খুশবু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

উদ্বেগের সাথে পিকু জানতে চাইল, "তারপর কি হল?" পিকু খুশবুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, খুশবুর চোখ দুটোর মধ্যে কষ্টের একটা ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ঠিক যেমন বৃষ্টি হওয়ার আগে আকাশ কালো আঁধারে ঢেকে যায়, ঠিক তেমনই।

খুশবু আবার বলতে শুরু করল – "আমি সেদিন শুধু বাড়ি ছাড়িনি, বাড়ির সাথে সাথে এই দেশও ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। মোটা টাকার বিনিময়ে ইমতিয়াজ আমাকে তুলে দিয়েছিল এই উগ্রপন্থিদের ডেরায়। তবে শুধু আমি নই, আমার মতো আরও অনেকজনকে সে তুলে দিয়েছিল ওই দলের কাছে। পরে জেনেছিলাম ইমতিয়াজের কাজই হল এটা, মেয়েদের অপহরণ করা। অল্প সুখ খুঁজতে গিয়ে

পেলাম যন্ত্রণার মহাসাগর। প্রতি মুহূর্তে প্রাণের ভয়কে তাড়না করতে করতে কবে যেন প্রাণভয়ও চলে গেল। সকালে চলত সমাজে ত্রাস ছড়ানোর শিক্ষা আর রাতে চলত শরীর বিকিয়ে দেওয়ার আদেশ। আর না মানলে চলত জোর জবরদস্তি। মাঝে মাঝে মনে হত মরে যাই। কিন্তু মরতেও পারিনি... কোথাও মনে হয়েছে একদিন হয়তো আলোর খোঁজ পাব। এই আশায় বেঁচে আছি। পিকু আমি আর কোনদিনই একটু ভালোবাসার সুখ পেলামনা। তবে এখন যদি মরেও যাই, দুঃখ পাবো না। জীবনে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে ক্ষণিকের জন্য হলেও কাছে পেয়েছি। এই ভেবে শান্তিতে মরতে পারব। তবে তার আগে তোমাকে বাঁচাতে হবে। সে আমার যাই হোক।”

পিকু হাতটা দিয়ে খুশবুর মুখটা চাপা দিয়ে বলল, আমি একা নই, আমরা দুজনেই বাঁচব, আর ওদের প্ল্যান আমরা পুলিশকেও জানাব। সবাইকে বাঁচাতে হবে।

— না, পিকু তুমি জানো না ওরা কতটা ভয়ানক, তোমাকে আমাকে দুজনকেই মেরে ফেলবে।

— চিন্তা করোনা। আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে। দেখি না শেষ চেষ্টা করে। পিকু খুশবুকে প্ল্যানটা বুঝিয়ে বলল।

চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেছে, খবরে, ইন্টারনেটে সব জায়গায় আজকে একটাই খবর, “দিল্লির নাম করা হোটেল ও এয়ারপোর্ট যারা একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতে

চেয়েছিল, সেই উগ্রপন্থির দলকে হাতে নাতে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে কেয়া নামধারী মহিলা নিহত হয়েছে। বাকিরা পুলিশী হেফাজতে। বাকি দলের খোঁজ করা হচ্ছে।"

##

দেখতে দেখতে পাঁচ মাস কেটে গেছে। পিকু তার টি-টেবিলের সামনে বসে ল্যাপটপে কাজ করছে। একটা নরম হাত পিকুর সামনে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিল। পিকু চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস খুশবু।"

খুশবু হেসে বলল, "ওয়েলকাম পিকু।" চায়ে এক চুমুক দিয়ে পিকু বলল, "আহা চা-টা আজ খাসা বানিয়েছ। সকালে তোমার হাতে চা পান করার একটা অভ্যেস করে দিয়েছ। সব কাজ আবার শুরু হলে তো আমি আবার এদেশ-সেদেশ। তখন কি করে এই চা পাবো বল তো! একটাই উপায় আছে তোমাকেও সঙ্গে করে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। কি বলো খুশবু ম্যাডাম?

খুশবু মুচকি হেসে উত্তর দেয় "যা তোমার মন চায়, তাই করো তখন।"

আবার চা-এ এক চুমুক দিয়ে পিকু বলে, "তোমার মনে আছে তো আজ তোমাকে রাজসাক্ষ্য দিতে হবে? জানিনা বিচারে তোমার কি শাস্তি হবে! তবে তোমার মতো বন্ধুকে আমি আর হারাতে চাইনা। এই সাতটা মাস সি বি আই এর পরামর্শ মতো কিভাবে যে তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে

রেখেছি... সে আমিই জানি। সি বি আই এর পরামর্শ মতো, আমাদের দুজনকে এই ফ্ল্যাটে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। সব হোম ডেলিভারি করে আনা হচ্ছে। দু'জনের যেন জেল বন্দি আসামীর মতো হাল। আমিও তো এই কয়েক মাস বাড়িতে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে পারিনি। যাক আজকের পর আমরা মুক্ত হব। তবে এটা দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে যে তুমি বেঁচে আছো। সেদিন যদি এই প্ল্যানটা না করতাম তাহলে হয়তো আজ আমরা কেউ-ই বেঁচে থাকতে পারতাম না, তাই না বলো!"

— হ্যাঁ ঠিক বলেছ পিকু। তোমার জন্যই আবার অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরতে পারছি। তুমি-ই সেদিন পুলিশকে খবর দিয়েছিলে। আর পুলিশকে অনুরোধ করেছিলে এটা বলতে যে, আমি তোমাকে আহত করে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে নিহত হয়েছি। আর তোমার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। তবে এখনও আমার ভয় হয়। তবে নিজের জন্য নয়। তোমার যদি কিছু হয় তাহলে তো আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। তোমার সংসার আছে, তাদের কাছে চির অপরাধী হয়ে যাবো। আমি জানি ওরা কতটা ভয়ঙ্কর। সব পারে ওরা।

— এতো ভেবো না খুশবু। তোমাকে আবার জীবনটা নতুন করে শুরু করতে হবে। আর আমার সংসার! আমার স্ত্রী তো অর্থ চায়, আমি কোথায় ওর জীবনে? জানো খুশবু

তোমার মতো আরেকজনও আছে যাকে আমি না বলেই চলে এসে ছিলাম। কি জানি সে এখন কোথায়? খুব দেখতে ইচ্ছা করে ?

— কে সে?

— আমার প্রেমিকা ছিল। নাম রোহিণী। চাকরি পেয়ে আমি কলকাতা থেকে যখন দিল্লি চলে আসি, তখন ওকে সেই খবরটা জানানো হয়নি। অনেকবার আমাকে ফোন করেছিল আমি কাজের চাপে ফোনও ধরিনি। আর যখন আমি ফোন করার সুযোগ পেলাম, তখন ও আর ফোন ধরেনি। কোনদিনও ধরেনি। একবারের জন্য হলেও দেখা যদি হয় আমার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইব।

— মন খারাপ করো না। আমার মতোই হয়তো একদিন তার সাথে তোমার দেখা হয়ে যাবে আবার। সবাই তো আমাদের চারপাশে থাকে, শুধু আমরা নির্বোধের মতো ভালো করে চোখ মেলে না দেখে, খুঁজে মরি।

— যাক বাদ দাও সে সব কথা। খুশবু, তুমি রেডি হয়ে নাও। আমি সামনের দোকান থেকে আসছি। একটু পড়ে পুলিশের গাড়ি আসবে। আমাদের একসাথে কোর্টে নিয়ে যাবে। শুধু চিন্তা হচ্ছে তোমার কি শাস্তি হবে! তবে যাই হোক, আমি তোমার পাশে সবসময় আছি আর থাকবো। খুশবু জানো তুমি আসার পর জীবনটা যেন আবার ছোটবেলার মতো সুন্দর হয়ে উঠছে।

— পিকু একটা কথা বলব...

— কি?

— এই সাতটা মাসে আমিও সাতটা সুন্দর জীবন কাটিয়ে দিলাম। লোভ হয়...এই জীবনটাকে ধরে রাখার। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার আজকের পর যাই শাস্তি হোক। তবু জানব আমার পাপের জীবন থেকে আমি চির মুক্তি পেয়েছি, এটাই শান্তি। আর শোনো আমার বেডরুমে রাখা ফুলদানীর ভিতরে একটা চিপ আছে, ওতে আমি উগ্রপন্থি দলের সব খুঁটিনাটি ডিটেলস রেকর্ড করে রেখেছি। যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তাহলে তুমি ওটা পুলিশের কাছে পৌঁছে দেবে।

— ধুর পাগলি, কি হবে তোমার! কিছু হবে না। সব সময় পজিটিভ ভাবনা ভাবতে হয়।

— তোমার কথা খুব মনে পড়বে সারাক্ষণ। তুমি সংশোধনাগারে আমার সাথে দেখা করতে আসবে তো?

পিকু খুশবুর কপালে ভালবাসার চুম্বন দিয়ে নম্র স্বরে বলে, "হ্যাঁ অবশ্যই আসব আমার পাগলি। আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে তোমার শাস্তির মেয়াদটা কোনভাবে কমানো যায়।" পিকু মনে মনে বলল... "আমি তো তোমারই অপেক্ষায় থাকবো খুশবু। তুমি জানো না, আমার স্ত্রী কয়েক মাস আগেই আমাকে ছেড়ে অন্য কারোর সাথে নতুন করে ঘর বেঁধেছে। ভেবেছে একজন স্মৃতিশক্তি হারানো পলাতক মানুষের সাথে থাকা যায় না আর। তবে

সে খবর এখন তোমাকে জানাতে চাই না। তুমি ফিরে এলে আমার মনের কথাটা নয় তখন বলব।"

এরপর পিকু সামনের দোকান থেকে খুশবুর পছন্দের ফুল আর আইসক্রিম কিনতে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর দোকান থেকে ফিরে এসে দেখে সামনের দরজাটা খোলা। পিকু ঘরে ঢুকে খুশব খুশবু করে ডাকল। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। সারা বাড়ি খুঁজেও তাকে পেল না। হঠাৎ পিকুর ফোনটা বেজে উঠল। সি বি আই অনীশ দেবের ফোন। ফোন তুলতেই এক চরম সত্যের মুখোমুখি হতে হল পিকুকে। খুশবুর ছিন্নভিন্ন দেহটা নাকি বাইপাসের ধারে পড়ে আছে। কয়েকদিনের জন্য এখনও পিকুকে অন্তরালে পুলিশী কড়া নজরে থাকতে হবে। কারণ এবার তাদের টার্গেট পিকু। পিকু ফোনটা রেখে পরাজিত, সর্বহারা সৈনিকের মতো বসে পড়ে মেঝেতে। মাথাটা তার বনবন করে ঘুরতে থাকে, চারিদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসে। এক ঘর শূন্যতা পিকুকে যেন গ্রাস করতে আসছে। ঘরের যে দিকেই সে তাকায় সেই দিকেই যেন খুশবু স্মৃতির খুশবু (গন্ধ) হয়ে ছড়িয়ে আছে। পিকুর শুধু একটা কথাই মনে হয় বারবার... যেই স্বপনের ঘর খুশবুকে নিয়ে সে গড়তে চেয়েছিল, তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো নিমেষে... হায় বিধাতার কি পরিহাস!

কেটে গেছে একমাস, খুশবুর দেহ এখন কবরে সমাধিস্ত,

চির নিদ্রায় শায়িত। পিকু খুশবুর কথা মতো সেই চিপ সি বি আই এর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। খুশবুর রেকর্ড করা বয়ান মতো সেই উগ্রপন্থি দল ধরা পড়েছে। বহু মেয়েরা আবার ফিরতে পেরেছে নিজের বাড়িতে। অপহৃত অনেক নাবালক ছেলেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে আলোর পথে।

সমাজ ভুলে গেলেও, পিকু কখনও ভুলতে পারবেনা খুশবুর অবদান। আজ তার জন্যই অনেক খুশবুকে আর কেয়া হতে হবে না। কিন্তু এবার সব পিছুটান ছেড়ে খালি হাতে পিকুর দেশ ছাড়ার পালা। এক শীতের পড়ন্ত বিকালে পিকু খুশবুর পছন্দের হাসনুহানা ফুল দিয়ে নিজের হাতে তার কবর সাজিয়ে দিল। সেই ফুলের উপর চকচক করছিল দু-এক ফোঁটা জলের বিন্দু। পিকু যে আজ ভালবাসার জলে খুশবুকে শেষ বারের মতো বিদায় জানাতে এসেছে। আস্তে আস্তে আকাশটা কামরাঙার মতো লাল হয়ে উঠল... সামনের শুকনো পাতা ঝরা পথ ধরে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দূর থেকে আরও দূর পথ ধরে ধীর পায়ে পিকু চলে গেল চলতি পথে। এই ঝোরে পড়া শীতের শুকনো পাতাগুলোর মতো পিকুর ভালবাসার পাতাটাও আজ চিরদিনের মতো ঝরে গেছে... তবে কি পিকুর জীবনে বসন্তের কোনো স্থায়ী অস্তিত্বই ছিল না! পিকুর মতো মানুষদের জীবনের ‘চার ঋতু অধ্যায়’... সবটাই হয়তো হয় ক্ষণিকের জন্য...

(সমাপ্ত) ■

নতুন বই
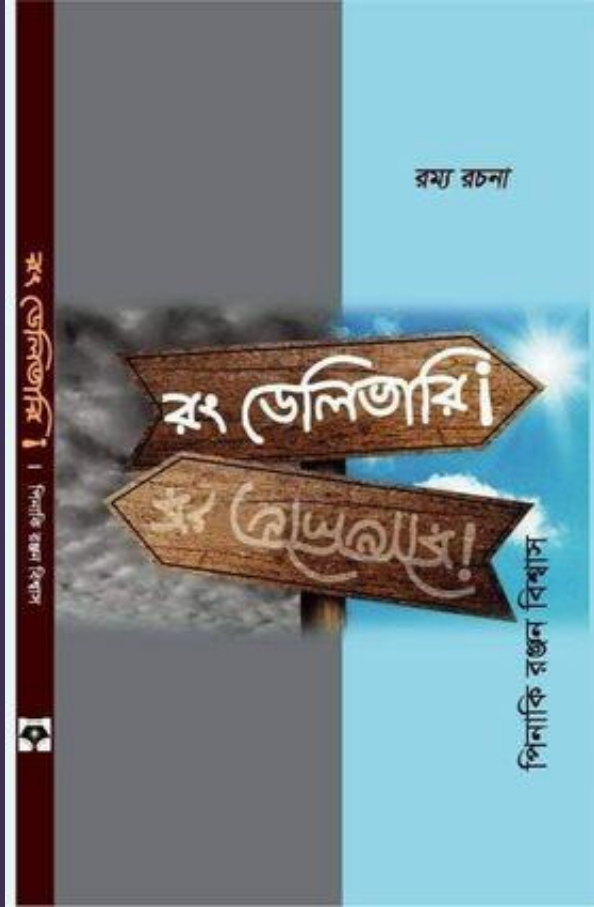
প্রতি পাতায় ভরা হাসি

যা কখনও হয়না বাসী...

সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব রম্য রচনার সমাহার...

প্রাপ্তিস্থলঃ

https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery

ভারতে শীঘ্রই আসছে...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ ঐতিহ্য...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত পুস্তক

ওরা কাজ করে

সংহিতা ভট্টাচার্য্য

ওরা কাজ করে
তাই ঘাম ঝরে
ন্যায় নীতির পরোয়া করে
তাই খেটে মরে।

ওরা ভাবে অপরের কথা
তাই যত মাথাব্যথা,
সময়ে অসময়ে ওদের ব্যস্ততা
ওরা জানে না ভণিতা।

মানুষ ওরা, নয় নামি-দামি
ঘাম যাদের রক্তের চেয়ে দামী,
ওরাই দেশের আসল কারিগর
হায়! মেডেল-শূন্য ওদের ঘর। ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দর বনে ত্রাণ বিতরণ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রীতম পাল

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

নস্টালজিক

গড়িয়াহাট মোড় ও নীরা

অমিত নাগ (আমেরিকা)

কেমন যেন ধরেই নিয়েছিলাম নীরা আর নীলু দেশপ্রিয় পার্কের আশেপাশেই কোথাও থাকে। স্কুল বয়সে হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া এক গ্রীষ্মের দুপুরে সুনীল গাঙ্গুলীর নীললোহিত পড়ার সময় একটা গল্পে অমনটাই লেখা ছিল যে। ওই যে যেটায় রাসবিহারী এভিনিউ ধরে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে যেতে যেতে নীলু দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে কুকুরের বকলস হাতে সাদা স্পোর্টস শার্ট আর শর্টস পরা অমলকে হেঁটে চলে যেতে দেখে। অমল পাইলট। অমল ঝকঝকে নীল আকাশের বুক চিরে রুপোলি প্লেন চালিয়ে আজ কাবুল পরশু লন্ডন তরশু ইস্তাম্বুল গিয়ে ঠিকঠাক দেশপ্রিয় পার্কের কাছে নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসে। ভুল হয় না কখনো। অমল নীরার করপ্রার্থী। কিন্তু নীলু অমলকে নীরার যোগ্য বলে মনে করে না।

পাঁচ নম্বর দোতলা বাসে ইউনিভার্সিটি যাবার সময়, ওপর থেকে দেশপ্রিয় পার্কে চোখ রেখে দেখতে পেতাম সাদা জামা প্যান্ট পরা যুবকের দল নেট টাঙিয়ে লাল ডিউস বলে ক্রিকেট খেলছে। প্যাড পরা বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিমায় আস্তে করে ঠুকে স্পিন বল রুখে দিচ্ছে

অথবা সজোরে লেগ অনে ড্রাইভ। তখনো সবুজ পার্কের মাঠ জুড়ে আজকের দানবাকৃতি সোশ্যাল ক্লাবের বাড়ি, উত্তর দিকের স্থায়ী মঞ্চ এসব তৈরী হয়নি। দোতলা বাসের ওপর থেকে পুরো পার্ক আর খেলার মাঠ স্পষ্ট দেখা যেত। দেখতাম আর ভাবতাম এই বুঝি মাঠের পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়ে প্রিয়া সিনেমার পাশ দিয়ে সুবেশ সুপুরুষ অমলকে হেঁটে আসতে দেখবো পাউচ থেকে বার করা সুগন্ধি তামাক দিয়ে সিগারেট রোল করতে করতে, অথবা দক্ষিণ দিকের রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হেঁটে চলা অগোছালো নীলুকে চারমিনার মুখে।

সেদিন দেখলাম দক্ষিণ কলকাতায় বেড়ে ওঠা প্রৌঢ়া অভিজাত এক মহিলা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, তাঁদের অল্প বয়সে মন খারাপ ঠিক করার ওষুধ ছিল গড়িয়াহাটে ঘুরতে যাওয়া, হকারদের দোকানে দোকানে ঢুঁ মারা। কথাটা যে কি আশ্চর্যভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভীষণ ভাবে মিলে যায়, ভেবে অবাক হয়ে গেলুম। ইউনিভার্সিটির ব্যস্ততা, পড়াশুনো নিয়ে নাজেহাল অবস্থা, পকেটে পয়সা নেই, ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততা নেই, টিউশন পড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে না, প্রেমিকা জোটানো হয়ে ওঠেনি - সব সমস্যার একটাই সমাধান, গড়িয়াহাট ঘুরে মন ফুরফুরে করে আসা। বিকেল বিকেল পড়ন্ত আলোয় এসে পড়তে পারলে, হকারদের দোকানের সামনের ভিড় এড়িয়ে, ট্রেডার্স

নস্টালজিক

এসেম্বলির ফুটপাথ ধরে পশ্চিম দিকে হাঁটা লাগানো যায় বেশ। বাসন্তীদেবী কলেজের পর আর পথ আগলিয়ে হকারদের ষ্টল নেই। রাসবিহারী এভিনিউ তখন সত্যি সত্যি এভিনিউ, দুধার গাছের ক্যানোপি দিয়ে ঢাকা। গাছে গাছে পড়ন্ত বিকেলে ঘরে ফেরা পাখির দলের কিচিরমিচির আওয়াজ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে সবুজ গালিচা পাতা জমির ওপর দিয়ে ঠঙ ঠঙ আওয়াজ করতে করতে ট্রাম চলে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে গাড়িবারান্দা আর ব্যালকোনিওলা দোতলা তিনতলা প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগানের গাছে গাছেও সেই পাখির কিচিরমিচির। মহানির্বান মঠ থেকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে সন্ধ্যারতি আর ভজন কীর্তনের শব্দ ভেসে আসছে। মহানির্বাণ মঠের উঁচু ফুলে ফুলে ছাওয়া নাগকেশর গাছের থেকে পাঁচিল টপকে ঝরে পড়া ফুল ছড়িয়ে আছে ফুটপাথ জুড়ে। সে ফুলের মৃদু গন্ধে বিনা কারণে হৃদয় বেদনামথিত হয়ে ওঠে। ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক আর মহানির্বান মঠের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গাটায় পা থমকে যায়। কেমন বদ্ধ ধারণা ছিল নীরার বাড়ি এই রাস্তার দু'দিকের কোন এক জায়গায়। হয় মনোহরপুকুর রোডের দিকে অথবা উল্টোদিকের পূর্ণদাস রোড, পণ্ডিতিয়া রোডের পাড়ায়।

দেশপ্রিয় পার্ক ছুঁয়েই উল্টো দিকে ফেরার পালা। এবার রাস্তার অন্য দিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়াহাটের

নস্টালজিক

কাছাকাছি আসতেই জায়গাটা আলো ঝলমল করে উঠে। কিংবদন্তির পাঞ্জাবির দোকানের কাছ থেকেই হকারদের ফুটপাথ ঘেরা দোকানগুলো শুরু হয়ে গেছে। তাদের টাঙানো সাধারণ আলোর বাল্‌ব আর উল্টো দিকের স্থায়ী দোকানগুলোর মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের আলোয় প্লাষ্টিক তেরপলে ঢাকা ফুটপাথ আলোয় আলোকিত। হকারদের দোকানগুলো শুধু রাস্তার দিকে। স্থায়ী দোকানের দিকে সিঁড়ি বা দরজার পাশে হকারদের স্থান ছিল না। শোকেসের সাজানো দ্রব্যগুলো তাই দেখা যেত পরিষ্কার। স্থায়ী দোকানের তুলনায় হকারদের জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি - হয়তো বৈচিত্র্যের কারণে অথবা তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা বলেও। শাড়ি, পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ থেকে ঘর সাজানোর টুকিটাকি, গয়না, প্লাস্টিকের নকল ফুল লতাপাতা, খেলনা, কি নেই! সুন্দরী মেয়ের দল অভিভাবক মহিলাদের সাথে হকার স্টলে জিনিস দেখছে, দরদাম করছে। সুন্দরী মেয়েরা একা একা ঘোরে না। যদি আমাদের মতো বাউণ্ডুলেদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়! কিশোরী বয়েস থেকে কলেজের ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ার অবধি মা অথবা যৌথ পরিবারের কমবয়সী কাকিমা গোত্রীয় কারো রক্ষাকবচের আড়ালে দোকানে, রাস্তায় বেরোনো। আরো বড়ো হলে, মানে কলেজের সিনিয়র ইয়ার বা ইউনিভার্সিটির দিনগুলোতে এক ঝাঁক

বন্ধুর সঙ্গে ঘোরা। সুন্দরীরা কি স্বেচ্ছায় নিজের থেকে তুলনামূলকভাবে অল্প সুন্দরীদের বন্ধু হিসেবে বেছে নেয় - অনেকবার এমন প্রশ্ন জেগেছে মনে। প্রায়শই অমনটা দেখেছি কিনা। হয়তো দেখার ভুল, অথবা হয়তো মেয়ের দলের মাঝে সব থেকে বেশি সুন্দর দেখাবে বলে অমনটাই করে থাকে কেউ কেউ।

ঠিক গড়িয়াহাটের মোড়টায় মানুষে মানুষে ছয়লাপ। ওপারে তিনদিকে বড়ো বড়ো দোকান। গড়িয়াহাট বাজারের দিকে আনন্দমেলায় ঝাঁ চকচকে লেটেস্ট ইলেক্ট্রনিক্স মিউসিক সিস্টেম, টিভি ঝলমল করছে, আর বাকি দুই কোনে বেনারসী হাট, ট্রেডার্স অ্যাসেম্বলি, ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়। এপারের কোণে হকারদের রমরমা একটু বেশি। বড় দোকানের ছিটকে আসা সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত হকার স্টলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি খানিকক্ষণ। যদি নীরার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এক ঝলক! হয়তো দেখবো কাকিমার পাশে দাঁড়িয়ে দরদাম করছে। পরনে সবুজ পাড়ের হালকা ঘিয়ে রঙের শাড়ি। সবুজ ব্লাউস। ক্যাটকেটে সবুজ নয় মোটেও, ম্যাট কালার অথবা সেজ রঙের সবুজ। নীরা ক্যাটকেটে সবুজ পছন্দ করতেই পারে না। শিল্পীর মতো সরু সরু আঙুলওলা ফর্সা দু'হাত সম্পূর্ণ নিরাভরণ। বড়ো জোর সরু চামড়ার স্ট্র্যাপ দেওয়া ছোট্ট মাপের ঘড়ি এক হাতে। কানে ছোট ছোট পান্না ঘেরা

মুক্তোর ছোট মাপের স্টাড। ফুটপাথের সৌখিন গয়নার দোকানে শখের দোকানদারি করছে। কাকিমাই কথা বলছে বেশি হকারটির সঙ্গে। নীরা শুধু নীচুস্বরে নিজের মতামত জানিয়ে দিচ্ছে আর তার সেই অতিচেনা প্রশ্রয়ী হাসিটি নিয়ে হকারটির দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। সে বেচারী সেই হাসিতে স্পষ্টত ধরাশায়ী। হবে নাই বা কেন। রাস্তা শুদ্ধ এক গড়িয়াহাট লোক সোজাসুজি বা আবডাল থেকে সবাই যে ওই দিকেই তাকিয়ে।

অথবা হয়তো দেখবো নীলুদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে নীরা রাস্তা পেরোবে বলে। অগোছালো উস্কোখুস্কো এক মাথা চুল, বহুব্যবহৃত পাঞ্জাবি গায়ে ঝোলা ব্যাগ কাঁধে নীলুদা। নীলুদা ডান হাতের চারমিনারে একটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কেন তাকিয়ে আছে, কে জানে। তারা দেখার চেষ্টা করছে বোধহয়। অথচ একটা বাচ্চা ছেলেও জানে চারিদিকের দোকানের এই এতো আলোয় গড়িয়াহাটের আকাশে তারা দেখা যায় না। নীরা হাত ব্যাগ থেকে বার করা শিল্পীর মতো আঙুলে তুলির মতো করে ধরা পয়সা পরম মমতায় এগিয়ে দিচ্ছে ভিখারি বাচ্চা ছেলেটার বাটিতে। নীলুদাও দিতে পারতো। এমন নয় যে দিতে ইচ্ছে হয় না, বা নীলুদার হৃদয় মমতাহীন। অথচ কি-ই বা করা। টিউশনের টাকায় সারা মাসের সিগারেট বা ট্রাম বাসের ভাড়ার খরচাই মেটানো যায় না। বন্ধুদের কাছে

ধার বাড়ে শুধু। রাস্তা পেরিয়ে ওরা যাবে আনন্দমেলার কোনটায়। গড়িয়াহাট মার্কেটের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বাজারের মেন দরজার পাশে হিন্দুস্থানীর সিগারেটের দোকানে দাঁড়াবে নীলুদা। শেষ সিগেরেটের শেষ টুকরো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়াতে থাকবে নীলুদা। নীরা হেসে বলবে দাঁড়াও। তারপর তার ছোট শৌখিন পার্শ থেকে বের করে দোকানদারের দিকে টাকা এগিয়ে দেবে নীরা। এমনটা প্রায়ই হয়। নীলুদার একটু অস্বস্তি হয় কিন্তু লজ্জা করে না। এখান থেকে দু'তিনটে অপশন ওদের। হয়তো বিজন সেতুর পাশ দিয়ে গিয়ে, বাঁদিকে জামীর লেনে ঢুকে পাশাপাশি হাঁটতে থাকবে ওরা পি সি সরকার ইন্দ্রজাল বাড়ির পাশ দিয়ে। এ জায়গাটা বেশ শান্ত নির্জন। গড়িয়াহাটের হট্টগোলের আওয়াজ এসে পৌঁছয় না। পন্ডিত বলরাম পাঠকের বাড়ি থেকে সেতারে বেহাগের আলাপ ভেসে এসে রাস্তা ধুয়ে দেয়। আর মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসল ভেসে আসে পাঁচিলের ওপাশের রেললাইন থেকে। টুকটাক কথাবার্তা, বেশির ভাগ সময়ই নিঃস্তব্ধতা হাঁটতে থাকে ওদের সঙ্গী হয়ে। নীলু ভাবে কেন যে নীরার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে ভালো লাগে বুঝতে পারি না। নীরা ভাবে নীলুটা কি চিরদিনই এমন বাউণ্ডুলে রয়ে যাবে! একটু লোকজন আর আলো-আঁধারীর মধ্যে হাঁটতে ইচ্ছে হলে

নস্টালজিক

ওরা চলে যাবে উল্টো দিকের ফার্ন প্লেস, একডালিয়া প্লেস হয়ে স্টেশন রোড এর দিকটায়। দিনের বেলা হলে নীলুদা ঠিক বালিগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে নীরাকে নিয়ে ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উঠে বসতো, নীরার আপত্তি না শুনে। নীরা রাগ করলে সোনারপুর, চম্পাহাটি বা পিয়ালীতে দুম করে নেমে খানিক ঘুরে ফিরতি ট্রেনে উঠে বসা আর রাগ না করলে সেই শেষ স্টেশন ক্যানিংএ গিয়ে থামা। আমি জানি ঠিক এমনই করবে নীলুদা।

নীরার সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায় না কখনোই। প্রায় নীরার মতো কোনো কোনো মেয়েকে দেখি অবশ্য। ওরকমই মন খারাপ করে দেওয়া সুন্দর অথচ কেন যেন ঠিক নীরা নয়! তখন গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার হয়নি। গড়িয়াহাট বাজারের শেষ হতে হতে শেষ ফলের দোকান থেমে গেছে উঁচু সিঁড়ি ধরে ওঠা কমল এন্ড কমল জুতোর দোকানের আগেই। বাজারের রেশ এখনকার মতো গোলপার্ক অবধি পৌঁছে যায়নি। বাঞ্ছারামও ছিল না। কিন্তু তার পাশে ছিল পাঁচিল ঘেরা বাগানওলা একটা সাদা দোতলা বাড়ি আর কাছেই অনেকদিনের বহুতল মেঘমল্লার। মেঘমল্লারের লোহার গেট খুলে বেরিয়ে আসতো সেইসব মন হুতাশ করে দেওয়া সুন্দরীরা, বেশিরভাগ সময়ই মা বা কাকিমার সঙ্গে। রাস্তার উল্টোদিকে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটলেও একই রকম বিস্ময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে পথের দু'ধারে।

নস্টালজিক

হকাররা সেদিকেও এখনকার মতো গোলপার্ক অবধি ফুটপাথ দখল করে বসেনি। হিন্দুস্তান পার্ক রোডের কাছাকাছি অবধি ফুটপাথ মোটামুটি খালি। বাড়িগুলোর একতলার দোকানগুলো দেখতে দেখতে দিব্বি পৌঁছে যাওয়া যায় গড়িয়াহাটের মোড়ে। হিন্দুস্তান পার্কএর মোড়ের কাছে ফুটপাথের ওপর পুরোনো ব্যবহৃত বইয়ের দোকান দুটো। সেখানে কামু কাফকার সঙ্গে একই মর্যাদায় প্রদর্শিত হয় সেই বয়সের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের ডেবোনেয়ার ম্যাগাজিন। হিন্দুস্তান পার্কে ডাকসাইটে সব সুন্দরীদের বাস। ফুটপাথ ধরে হকার স্টলের প্লাষ্টিক আর তেরপলের চাঁদোয়ার নীচে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাদের দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, মুহূর্তের জন্য মন ভালো হয়েই আবার গভীর বিষাদে ডুবে যায়। এমন সুন্দরীদের বেশিদিন গড়িয়াহাটে ঘুরতে দেখা যায় না। দু'দিন বাদেই সবাই প্রায় বিয়ে করে লন্ডন আমেরিকা জার্মানি পাড়ি দেয় চিরকালের মতো। নীরাও হয়তো এমনি যাবে একদিন। বাঁ হাতে একটা বহুতল বাড়ি বহুদিন ধরে প্লাস্টারহীন ইটের বহিরাকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ উঁচু অনেকতলা নিয়ে সেই বাড়ি অনেকগুলো ব্যাংক আর দোকানের ঠিকানা। তবু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অমন শ্রীহীন ইটের দেওয়াল নিয়ে বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে বাড়িটা। এ বাড়ির পাশেই এ এলাকার আরেক আকর্ষণ - সোনালী সাউথ ইন্ডিয়ান

রেস্টোরেন্ট। একই জায়গায় আগেও চলতো নির্মলা নামে দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের দোকান। একচিলতে লম্বা জমিতে টিনের চালের সরুমতো একটা রেস্টোরেন্ট। তা বলে তার আকর্ষণ কম নয় নামীদামী রেস্টোরেন্টের চেয়ে। কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের ভীড়ে সব সময় জমজমাট।

অনেকদিন বাদে সেবার আমাদের পুরোনো মন খারাপ ভালো করে দেওয়া গড়িয়াহাটের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সব কিছু কেমন যেন বদলে গেছে। প্রথমেই খটকা লাগে কানে পথচলতি মানুষের কথাবার্তার ভাষা। প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি লোকে কথা বলছে হিন্দিতে। সেই কবে থেকে দেখে আসছি বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দক্ষিণ থেকে ঘটিদের স্থানচ্যুত করে ফেলছে বাঙালরা। গড়িয়াহাট আর ঢাকুরিয়া ব্রিজের পর থেকে তো বাঙালদেরই একাধিপত্য। স্বাভাবিকভাবে গড়িয়াহাটে প্রাধান্য ছিল বাংলা ভাষার এবং নজরনীয়ভাবে বাঙাল ভাষারও। ঘটিদের সরিয়ে দেওয়া বাঙালরাও তা হলে পিছু হটতে শুরু করেছে আরো আরো দক্ষিণে। আমাদের সাধের সোনালী উঠে গিয়ে তার জায়গায় অন্য রেস্টোরেন্ট। সাবেকি দোকানের আকর্ষণও কমছে। তার জায়গা দখল করছে আধুনিক বুটিক স্টোর্স। ছোটবেলায় বসাক বস্ত্রালয়ে মা কাকিমার সঙ্গে শাড়ি কেনার বাহানায় ঘুরতে এসেছিলাম। বসাক বস্ত্রালয়ের ঢালা সাদা গদিপাতা ছোটছোট পাশবালিশওলা বিরাট বসার জায়গাটা

দেখে লোভ হয়েছিল চোখবুজে গড়াগড়ি খাবার। দোকানের কর্মচারীরা একের পর এক শাড়ি খুলে মেলে ধরছে, বড়োদের বিস্ময় আর প্রশংসা ভরা দৃষ্টি, নতুন শাড়ির গন্ধে বাতাস ভরে উঠছে, আর আমি ভাবছি ওই শাড়ির চাঁদোয়ার নীচে দিয়ে এই সাদা জাজিমের ওপর গড়াগড়ি খেতে পারলে বেশ হয়। এখন হয়তো বসাক আর নতুন যুগের মেয়েদের মন কাড়তে পারে না তেমন করে। হিন্দুস্থান রোডের কণিস্ক জাতীয় বুটিক স্টোরেদের কদর বেশি।

আমরা যারা কর্মসূত্রে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি বহুদিন আগে, দিল্লী, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, দুবাই, লন্ডন নিউইয়র্ক থেকে এক দু বা তিন বছরে আসি একবার, কলকাতায় আত্মীয় বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে খেতে ওষ্ঠাগত প্রাণ, মলে মলে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত সেই একদা যুবক জীবনের নিয়মে আজ প্রৌঢ় পুরুষেরা, কাজের অছিলায় বাড়ির লোকের নজর এড়িয়ে একা একা বেরিয়ে টুক করে গড়িয়াহাট ঘুরতে আসি কেউ কেউ। দেখতে ইচ্ছে হয় গড়িয়াহাট আগের মতো চিনতে পারে কিনা। আগের মতোই মন ভালো করে দিতে পারে কিনা। নীরাদের এখনো দেখা যায় কিনা। তেমনি এসেছিলাম এবার। গড়িয়াহাটের ঠিক মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কোনের দোকান থেকে কেনা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগ্রহভরে দেখছিলাম চারিদিক। এখন আর সিগারেট

খাওয়া হয় না তেমন। সব জায়গাতেই এতো বিধিনিষেধ। পকেটে সিগারেটের প্যাকেট থাকে না তাই। তবু ইচ্ছে হলো পুরোনো দিনের মতো নিজেকে একটা ট্রিট দিতে। মেয়েদের পোশাক বদলে গেছে। নীরার মতো শাড়ি পরিহিতা সহজ কিন্তু আধুনিকা বুদ্ধিদীপ্ত মমতাময় চোখের স্নিগ্ধ আবেদনময় রূপের কাউকে চোখে পড়ে না। কেমন যেন উগ্র পোশাকের ধরণ সবার - প্যান্ট শার্ট স্কার্টে পশ্চিমি অনুকরণের অন্ধ প্রচেষ্টা। ভাবি আমাদের যে দিন গেছে চলে তা কি একেবারেই গেছে! নীরারা কি আর আসে না এখানে আগের মতো। পরক্ষণেই মনে হয় কি করে আসবে - তাদের মতো সুন্দরীরা তো সেই কবেই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। আর নীলুদারা এক মাথা জট পড়া চুল বুক অবধি অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি নিয়ে জীবনসংগ্রামেরত- ক্লান্ত অবসন্ন। তবু মাঝে মাঝে কলম ঝলসে ওঠে। লিখে ফেলে “ফিরে এস চাকা,” গোছের আর্তিভরা কবিতা। আমরাও জীবনের লম্বা চলার পথে দুঃখ আর হতাশাগুলো জড়ো করতে করতে, একের ওপর এক চাপিয়ে আকাশছোঁয়া মন খারাপের স্তুপ বানিয়ে ফেলেছি এক একজন। মনে মনে বলি গড়িয়াহাট, পারবে কি এই মন খারাপের আকাশমিনার ধূলিস্যাৎ করে দিতে! তুমি হয়তো সেই আগের মন ভালো করে দেবার ক্ষমতাটা হারিয়েই ফেলেছো শেষমেশ। কে যেন কানের পাশে পাশে ফিসফিসিয়ে বলে,

নস্টালজিক

ওই পাহাড় উঁচু মন খারাপগুলো হয়তো সরিয়ে দিতে পারবো না রে। তারজন্য তোকে একটু এলুফ হতে হবে। সব কিছুতে অতবেশি ইনভল্ভড আর নাই বা হলি আগের মতো। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আর ছোটো-খাটো মন খারাপের জন্য আমি তো রইলামই। চলে আসিস যখন ইচ্ছে হবে। নীরারাও আছে নতুন যুগে নতুন সাজে। শুধু দেখার মতো চোখ থাকা চাই। ■

লেখকদের প্রতি আবেদন

আপনারা ফটো পাঠানোর সময় খেয়াল রাখুন, আমাদের যথাযথ ফটোর সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই।

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ সমকালীন...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

দুধ সাদা বৃষ্টি চাই

দালান জাহান (বাংলাদেশ)

বিষণ্ণ পৃথিবীর পথে পথে আজ
এক পশলা বৃষ্টি চাই।
অই যে শহর গ্রাম বাড়ি
দৌড়ে যায় মৃত্যুর ঘোড়ায়
ক্ষুরে ক্ষুরে লেগে থাকে তৃষ্ণার লড়াই
প্রথম কেঁদেছিলো যে কালো মেহনতি হাত
সেই হাত ভর্তি বৃষ্টি চাই।
ফরমালিনে হলুদ নববধূর মতো কলা
ভবিষ্যতের আঁধার লম্বা বাড়িয়ে দেয় গলা
সে গলাই রাক্ষস পুড়াতে
চামেলি স্নিগ্ধ চন্দন চাই।
পকেট ভর্তি চিৎকার হাহাকার-আগুন
বাজুক হাতুড়ি চলুক শাবল
ক্ষুধার যন্ত্রণা নাশক সৃষ্টি চাই
বৃষ্টি চাই বৃষ্টি চাই।
অশান্ত ধরনীর দুয়ারে-দুয়ারে
দুধ সাদা বৃষ্টি চাই। ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল' (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুন ২০২১ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই মে, ২০২১

ফায়ার এসকেপ

ডঃ মালা মুখার্জী

রোজকার মতোই খুব ভোর ভোর উঠতে হয়েছে কেটকে। নিউইয়র্কের এই ঘিঞ্জি বস্তি ঘরের সাতশো ঝামেলা সামলে আটটার আগেই পৌঁছে যেতে হবে ফ্যাক্টরিতে, আর তারপর ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। কোনো কোনো রাতে তো খাওয়াও হয় না। ফ্যাক্টরি থেকে মাসান্তে যে গম, আর আলুর রেশন দেয় তা থেকে চাকিতে পিষে আটা বানিয়ে ব্রেড তৈরী করার মতো সময়টুকুও হয় না। ওই সকালবেলা যে পাঁউরুটি আর মাংস দেয়, ওটাই কেটের রোজকার স্টেপল ফুড, আর তারপর দুপুরে বার্গার বা স্যাণ্ডউইচ।

আজ অবশ্য দিনটা অন্যরকম, আজ ফ্যাক্টরির মালিক মি. ম্যাক্স ব্ল্যাঙ্ক আর মি. আইজাক হ্যারিস মিলে একটা গেট-টুগেদারের আয়োজন করেছেন। শ্রমিকদের পরিবারের লোকজন, বিশেষত বউ আর বাচ্চাদের নিয়ে আজ একটা নৈশভোজ হবে, শেষে নাচ গান। “এই কেট,” মার্গারেটের গলার স্বরে কেটের চটক ভাঙলো। মার্গারেট ঠিক ওর পিছনেই জলের ক্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে, টাইমকল থেকে জল ভরবে।

প্রতারণা

"আজ কি পরবি রে?" মার্গারেট সোয়ার্জ, হাসিখুশি স্বর্ণকেশিনী মেয়েটির মুখ আজ গোলাপি আভায় উদ্ভাসিত। কেট জানে কারণটা, কয়েকমাস ধরেই মার্গারেটের সাথে ম্যানেজারের ভাই বার্নস্টেইনের একটা গোপন লাভ অ্যাফায়ার চলছে। এটা কেউ না জানুক, কেট জানে। তাই আজকের পার্টিতে ওর ভালো দেখানোটা জরুরি।

অবশ্য কেটের কাছে কোনো ভালো পোশাক নেই। ভাগ্যের কি পরিহাস না? দিনরাত এক করে ওরা তৈরী করে শার্টওয়েস্ট, ফুলহাতা জামা, হাতে আর বুকে লেস বসানো মেয়েদের ব্লাউজ, যার কোমরটা চাপা। নিউ ইয়র্কের ধনীর দুলারিরা এই শার্টওয়েস্টের ওপর লংস্কার্ট পরে পার্টিতে আসেন। কত রকম কাটিংয়ের, কত রকম ধরণের ব্লাউজই না বানায় ওরা। আর এই শার্টওয়েস্ট সারা আমেরিকায় এমনকি কানাডা আর ইউরোপেও এক্সপোর্ট করা হয়। অথচ কেটের কাছে কোনো জামা নেই যাকে সেই অর্থে পার্টিওয়্যার বলা যায়।

"শোন না, স্যামুয়েলের স্ত্রী এসথার আমায় একটা নতুন ড্রেস দিয়েছে । ভাবছি, ওটাই পরবো..."

কেট ঠেস দিয়ে বলল, "নতুন না ছাই, দেখ, ডিজাইন পছন্দ হয়নি তোকে দিয়েছে। আর আফটার অল তুই ওদের বাড়ির বউ হবি..."

স্যামুয়েল বার্নস্টেইন এই কোম্পানির ম্যানেজার, বেশ

আমুদে মানুষ। ও ওয়ার্কার কোয়ার্টারেই থাকে, তবে, ঘিঞ্জি বস্তিতে নয়, ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্টে। বার্নস্টেইন লোকটিকে কেটের মোটেই ভালো লাগে না, কিন্তু কিছু করার নেই, মালিকপক্ষের আত্মীয়, আর সেই সুবাদে পুরো খানদান তুলে এনে ট্রায়াঙ্গল শার্টওয়েষ্ট ফ্যাক্টরির কাজে লাগিয়েছে। ওর কাকা আব্রাহাম, ভাই উইলিয়ম, সৎভাই মরিস, কাজিন স্যাম সবাইকে সুপারভাইজার করে দিয়েছে।

এসথার খুব খুঁতখুঁতে ফ্যাশনেবল মহিলা। এক্সপোর্ট কোয়ালিটি শার্টওয়েষ্ট পেটি থেকে বের হয়ে প্রথমে ওর কাছেই আসে। এসথার আমেরিকার ফ্যাশন দুনিয়ার হালহকিকত জানে। ওই-ই নাকি একদিন মার্গারেটকে বলেছিল, আমেরিকায় শার্টওয়েষ্ট ব্যাকডেটেট হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই কিনতে চাইছে না। অবশ্য এর মানে এটা নয় যে ফ্যাশন দুনিয়ায় শার্টওয়েষ্ট পুরোনো হয়ে গেছে। কারণটা রাজনৈতিক, না না রাজনীতির জটিল প্যাঁচ কেট বোঝে না। ও শুধু জানে দু'বছর আগে এই ফ্যাক্টরিতে লকআউট হয়েছিল। যে মহিলাকর্মীরা কাজ করতো, তারা মজুরি বৃদ্ধি আর আট ঘন্টা কাজের দাবীতে কি একটা সমাবেশ করেছিল, মিছিলেও হেঁটেছিল। ওদের সাথে অন্য ফ্যাক্টরির লোকেরাও ছিল, মানে মেয়েরা। কেট অবশ্য তখনও এখানে আসেনি, ও এডেনার কাছে শুনেছে। এডেনা কে? আরে, ওই যে সুন্দরী মেয়েটা টেলিফোনের কাছে বসে দিনরাত

কল রিসিভ করে, মিষ্টি হেসে শার্টওয়েস্টের অর্ডার নেয়। ওই, ওইই বলেছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সোশালিস্ট পার্টির লিডাররা ফ্যাক্টরির মেয়ে শ্রমিকদের খেপিয়ে কি একটা উইমেনস্ ডে নাকি করেছিল। এডেনাও গিয়েছিল, অবশ্যই মালিকপক্ষের স্পাই হয়ে। ওই মহিলা লিডাররা বড় সুন্দর সুন্দর কথা বলছিলেন। মেয়ে আর ছেলে শ্রমিকদের সমস্যা নাকি এক নয়, মেয়েদের ঘরে-বাইরে সামলাতে হয়, তাই ম্যাটারনিটি লিভ, চাইল্ড কেয়ার এসব দিতে হবে। আট-দশ ঘন্টার বেশি খাটাতেও পারবে না। এডেনা বলেছে, আর হেসে গড়িয়ে পড়েছে, এসব আবার হয় নাকি?

কেট আনমনা হয়ে হেসেছিল। ও শ্রমিক পরিবারেরই মেয়ে। বাবা-মায়ের সাথে ফিলাডেলফিয়ার শ্রমিক বস্তিতে বেড়ে উঠেছে। ও তো বরাবরই ওর মা এমিলিকে দেখেছে ঘরে বাইরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে। বাবা ও কাজ করতো, কাজের পর ইয়ার-দোস্তদের সাথে ফূর্তি, জুয়াখেলা, আর মা? মা তখন গম পিষে আটা করতো, কাপড় ধুতো, খাবার বানাতো, আরো কত কি। কেট তো পাঁচবোনের বড়। মা কত বড়ো পেট নিয়েও ফ্যাক্টরিতে যেত, যতক্ষণ না লেবার পেন হতো ছুটি মিলতো না। আরে, ছোটবোন লুসি তো ফ্যাক্টরিতেই হলো! আর মা ধকল সহ্য করতে না পেরে মরলো। আজও মনে পড়ে কেটের ওইসব কথাগুলো। আর বাবা কি করলো? পরের

মাসেই তো ওর স্টেপমাদার এফি, বাবার নতুন বউ হয়ে এল, কেট তখন বছর দশেকের বেশি তো নয়।

"এসব কি সত্যি হবে?"

"কি সত্যি হবে? ওই লিভ? কামচোর কোথাকার," এডেনা মৃদু ধমক দিয়েছিল ওকে, "জানিস যারা ওই সভায় আর মিছিলে গিয়েছিল তাদের কি হয়েছিল?" কেট জানে না। এডেনা বলেছিল সেদিন যারা ওই সভায় গিয়েছিল, ওই মিছিলে হেঁটেছিল তাদের রাতারাতি বরখাস্ত করা হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল ফ্যাক্টরির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তা হয়নি। বাকিটা আর এডেনাকে বলতে হয়নি। কেট জানে। রাতারাতি ওই ম্যানেজার বার্নস্টেইন নিউইয়র্কের পতিতাপল্লীর মেয়েদের কারখানায় কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে, আর তার মধ্যে ষোড়শী কেট অল্টারম্যানের নামটাও কি ছিল না? মাত্র ছ'মাস আগে পেটের দায়ে আর কতকটা সৎমার সংসার থেকে ছুটকারা পেতেই কেট নিউইয়র্কে এসেছিল। ভদ্রজীবন ওর স্বপ্ন ছিল, তাই তো অগ্রপশ্চাৎ ভাবেনি। আচ্ছা, কারখানায় কাজ করতে করতে ওর অবস্থাও কি মায়ের মতো হবে!

"এই কেট জলদি জল নে," পিছনের জন তাড়া মারলো। কেট জল ভরে পা চলালো। স্যাঁতস্যাঁতে বস্তি ঘরে ওর এমন কিছু মহার্ঘ্য সম্পত্তি নেই, তবুও সবচেয়ে ভালো স্কার্টটা আর ব্লাউজটা পরলো ও। আজ মালিক নৈশভোজ

দেবে, কোম্পানির প্রচুর মুনাফা হয়েছে। মলিক আইজ্যাক হ্যারিস বলেছেন উনি ভাবেনই-নি শিক্ষনবিশ মেয়েগুলো এত ভালো প্রোডাকশন করবে। সোশালিষ্টরা হেরে গেছে। পুরনো কর্মচারীরা ফিরে আসার জন্য পায়ে ধরছে, সেদিন মিছিল করাটাই ভুল হয়েছিল ওদের।

মার্গারেট নতুন পোশাকে সেজে গদগদ হয়ে চলেছে, ক্লারা, জুলি, স্টিফানিরাও চলেছে, ওদের ছেলেমেয়েরাও আছে। কিছু দূর হাঁটতেই ন'তলা বিল্ডিংটি চোখে পড়ল, অ্যাসজ বিল্ডিং। এরই সাততলা, আটতলা, আর ন'তলায় ওদের অফিস, থুড়ি ফ্যাক্টরি। মাত্র চার মাসেই বেশ মায়া পড়ে গেছে কেটের। এই বিল্ডিংই হলো ওর স্বপ্নপুরী, ভদ্রভাবে বাঁচার একমাত্র ঠিকানা।

বিল্ডিংয়ের এক দিকের দরজা ওয়াশিংটন প্লেসের দিকে আর অপরটি গ্রিনস স্ট্রিটের দিকে। প্রথম গেটটা বন্ধই থাকে, একটা দরজাই সাধারণত ব্যবহার হয়, প্রয়োজন হলে অপরটা এই বিল্ডিংয়ের পাশেই হচ্ছে বিখ্যাত ল' ইউনিভার্সিটি, এই স্কুলের মাষ্টাররাই নাকি মেয়ে শ্রমিকগুলোকে খেপিয়ে ছিলেন, তাই এইদিকের গেটের সিঁড়িটা বন্ধ রাখা হয়েছে। শুধু মালিকরা আর সুপারভাইজাররা লিফ্টে করে এই দরজায় আসতে পারেন। লিফ্টম্যান যাকে তাকে ফ্যাক্টরিতে অ্যালাউ করবে না।

কেটের এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই, ও তেমন কাউকে

চেনে না। শুধু ওই প্রফেসর ফ্র্যাঙ্ক না কে যেন ওদের বস্তিতে গিয়ে মাঝে মাঝে কি সব বোঝান, শ্রমিকদের অধিকার না কি যেন!

"গুড মর্ণিং, লেডিজ," প্রৌঢ় লিফ্টম্যান জোসেফ জিটো হেসে বলল। লোকটা প্রতিদিনই ওদের এভাবে সম্বোধন করে। মার্গারেট লেডি কথাটা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। দ্বিতীয় লিফ্টম্যান জ্যাসপার গোমড়ামুখো, যেন হাসতে মানা। ওরা লিফ্টে চড়তে পারবে না, তাই জিটোকে গুড মর্ণিং করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

ওরা ওদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল, আটতলায়। সার সার সেলাইমেশিন সেখানে। এখুনি শুরু হবে সেলাই। আর একদিকে পিস কাটা চলছে। নতলাটায় অফিস। সাততলায় প্যাকিং চলছে, শার্টওয়েষ্ট নিউইয়র্কের দোকানে দোকানে যাবে, তারপর ধনী পরিবারের মেয়ে-বৌ'রা পছন্দ করবে। এই রেডি-মেড জামা দর্জিদের কাঁচিকে বিদায় দিয়েছে। জামা কেন আর পরো, কত সময় আর টাকাই না বাঁচছে!

ওদের কাজ শুরু হলো। কেটের পাশে বসে যে মেয়েটি – রোজি, তাকে ন'তলায় ডেকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে এথেল ও মনিকার সাথে রোজি ফিরলো, ওর মুখটা থমথম করছে। সুপারভাইজার উইলিয়ম বার্নস্টেইনের চোখ এড়িয়ে রোজি বলল, "জানিস কেট, মালিকের চেম্বারে মিটিং হচ্ছে।

আমাদের কোম্পানি ডুবতে বসেছে দেনার দায়ে...”

“ধুর, তাহলে আজ পার্টি হচ্ছে কিসের?”

“সেটাই তো। মালিক মি ব্ল্যাঙ্ক এসেছেন, মি হ্যারিসও আছেন, ওঁরা বলছেন এটা ছাড়া আর উপায় নেই...”

“কি ছাড়া?”

“সেটা শুনতে পাইনি...”

“এই মেয়েরা কথা বলবে না,” এতক্ষণে উইলিয়ম মার্গারেটকে ঝাড়ি মারা শেষ করে অন্যদের দিকে তাকানোর টাইম পেয়েছে। সময় গড়িয়ে চলছে। লাঞ্চ আওয়ারেও আজ ভালো খাবার দিয়েছে। ন’তলায় গ্রামোফোন এসেছে, নৈশভোজ শেষে নাচ। শ্রমিকদের বাচ্চারা গাইবে, কেটি ওয়েনার আর লিণ্ডা গান শেখাচ্ছে ওদের। আজ স্টেনোগ্রাফারদের ওই কাজ। পড়াশোনা জানা মেয়েদের কি সুখের চাকরি, কেট ভাবে।

রোজির কথাটা মার্গারেটকে জানাতেই ও বলল, “বাজে বকছে মেয়েটা। দুদিন কাজে আসেনি, বকা খেয়েছে। দেখ, আজ লাঞ্চের পর ও আবার কাটলো।” মার্গারেট আশ্বস্ত করলো, “শার্টওয়েষ্টের কোম্পানি দারুন চলছে।”

ঘড়ির কাঁটা চারটে থেকে সাড়ে চারটেতে গেল, আর কয়েক ঘন্টা বাদে সেই বহু প্রতিক্ষীত ক্ষণ। কেট জানলা দিয়ে দেখল, ওই প্রফেসরটা ক্লাস করাচ্ছেন। বোধহয় ধনীর দুলালদের লেবার-ল পড়াচ্ছেন, যার কোনো যৌক্তিকতাই

কেটদের জীবনে নেই। একদল শ্রমিক গেলে আর একদল আসবে। আন্দোলন করে কি হবে?

‘খক খক খক,’ কয়েকজন সহকর্মী হঠাৎ কাশতে শুরু করলো। বিষয়টা কি হয়েছে জানার আগেই কয়েকজন ফোরম্যান, লিফ্টের দিকে ছুটে গেল। মালিক দুজন লিফ্টে নেমে যাচ্ছেন।

মার্গারেটই প্রথম চেঁচালো, “ও মাই গড! ফায়ার!” সত্যিই তো কালো ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘরটা। মার্গারেট ছুটে গেল প্রেমিক উইলিয়ম বার্নস্টেইনের কাছে। উইলিয়ম ওকে আশ্বস্ত করলো। গ্রিন স্ট্রিটের দিকের দরজাটা দাউ দাউ করে চলছে। দ্বিতীয় সিঁড়িটা আছে তো। ওয়াশিংটন প্লেসের দরজাটার দিকে। কিন্তু সিঁড়ির চাবি কই? ওরা তো লিফ্ট পাবে না, ওটা উচ্চপদস্থদের জন্য।

কপাল মন্দ, ওই দরজার সিঁড়ি তো বন্ধ! ওটা বন্ধই থাকে। উইলিয়ম বলল, “মি হ্যারিসের চেম্বারে চাবি আছে। আমি নিয়ে আসছি।”

মার্গারেটকে ছেড়ে ও চলে গেল। মার্গারেট জড়িয়ে ধরল কেটকে, “আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে...”

“লিফ্টে চল...” কেট ওকে নিয়ে বাইরে বেরোলো। আশা, আজ হয়তো উঠতে দেবে! কিন্তু, লিফ্টে ওঠে সাধ্য কার? জ্যাসপার আর জিটো প্রাণপনে চেষ্টা করছেন যতবেশী সম্ভব মানুষকে নীচে নামাতে, যাতে ওয়াশিংটন প্লেসের দরজা

দিয়ে ওরা বেরোতে পারে। যতবার ওরা উঠতে যাচ্ছে ধাক্কা খাচ্ছে। ফোরম্যান, ম্যানেজার, সুপারভাইজারদের অগ্রাধিকার লিফ্টে। বেশীক্ষণ লিফ্ট চলবে না, তেতে উঠছে লিফ্ট দুটি। এটাই বোধহয় শেষ লিফ্ট। মার্গারেট অসহায়ের মতো দেখল ওই লিফ্টে উইলিয়ম। একটিই জায়গা আছে লিফ্টে। উইলিয়ম বলল, "চলে এসো ডার্লিং, এক সাথে বাঁচবো..." বিহ্বল মার্গারেট লিফ্টের দিকে পা বাড়াতেই উইলিয়ম ওকে ধাক্কা মারল, "তুই নয় রে, হোর। এসো এডেনা।"

এডেনা এগিয়ে এল, এডেনাকে হাত বাড়িয়ে ধরলো উইলিয়ম। লাস্ট পার্সনকে নিয়ে জ্যাসপারের লিফ্ট ছেড়ে দিল। মার্গারেট কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কেট জানে এই কান্না মৃত্যুভয়ের নয়, বিশ্বাসভঙ্গের। কেট বুঝলো উইলিয়ম কখনোই ভালোবাসেনি গরীব মার্গারেটকে, শিক্ষিতা সুন্দরী এডেনাই ওর প্রেমিকা ছিল। গরীব মেয়েগুলোর ভাবনা নিয়ে খেলত মাত্র। ওরা পিছন থেকে চাপ অনুভব করলো। মানুষগুলো লিফ্টের গর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। লিফ্টের মাথায়ও লোক, কারো কারো শরীর ঝলসে যাচ্ছে। কারো মনে নেই এসময়ে লিফ্ট ব্যবহার করতে নেই।

কেট আর মার্গারেট আবার ওদের সেলাই ঘরে এলো। যদি ওয়াশিংটন প্লেসের দিকের জানলাটা খোলা যায়! কেটের চোখে পড়ল ওই প্রফেসরটা ফায়ার ব্রিগেড নিয়ে এসেছে। লোকটাও ওদের দেখল, ইশারায় বলল ছাদে

যেতে, ছাদে উঠছে দমকলকর্মীরা। কেট মার্গারেটকে নিয়ে বেরোবে তার আগেই মার্গারেট কান্নায় ভেঙে পড়ল। ও ছুটে গেল ওয়াশরুমে। কেট বাধা দেওয়ার আগেই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনাটা... ওয়াশরুমের দরজায় আগুন ধরে গেলো। ভিতরে মার্গারেট, প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে। "কেট, আমি বাঁচতে চাই! বাঁচা আমাকে..." ওয়াশরুমের বাইরে চেঞ্জিংরুমে একটা ফারের কোট হ্যাঙারে ঝুলছিল। ওটা উল্টো হয়ে ওর মুখে পড়লো। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ও ছাদে উঠলো। খোলা হাওয়া লাগলো ওর মুখে, ছাদের ওপর দমকলকর্মীরা উঠে এসেছেন। তাঁদেরই একজন কেটকে দেখতে পেয়েছেন। কেট অজ্ঞান হয়ে গেল। কতক্ষণ ও অজ্ঞান ছিল তা কেট জানে না। যখন জ্ঞান এলো তখন কেট বুঝলো ওর গর্বের ট্রায়াঙ্গল গারমেন্ট ফ্যাক্টরি পুড়ে ছাই। নিজের অজান্তেই কেঁদে উঠলো কেট।

নার্স বললেন, "মিস কেট, য়্যু হ্যাভ আ ভিজিটর।" অবাক চোখে কেট দেখল সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় প্রফেসর ফ্র্যাঙ্ককে, ইনিই যথাসময়ে ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়েছেন। "থ্যাঙ্কস প্রফেসর, য়্যু হ্যাভ সেভড মি, অ্যাণ্ড মেনি লাইভস..."

"তুমি নিজে বেঁচেছ, কিন্তু তোমার বন্ধুরা বাঁচেনি। ১২৩ জন মেয়ে মারা গেছে। ফোরম্যান, সুপারভাইজাররা পালিয়েছে। জাস্টিস দেবে না ওদের?" ভদ্রলোকের কথায়

ও অবাক হলো, এটা তো দুর্ঘটনা মাত্র!

"দুর্ঘটনা নয়, মিস কেট। মি ব্ল্যাঙ্ক আর মি হ্যারিস দেনাগ্রস্ত। অভিজ্ঞ কর্মীদের বদলে শিক্ষানবিশ আর অনভিজ্ঞ শ্রমিক দিয়ে বানানো পোশাকের মান গত দুই বছর ধরেই পড়ছিল, তবুও দেনা করে টাকা ঢালে কোম্পানিতে। সেইমতো অর্ডার না পাওয়ায় ডুবতে বসেছিল কোম্পানি। তখনই এই ক্যাজুয়ালটি ঘটিয়ে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির থেকে মোটা টাকা হাতড়ানোর তালে ছিল।"

কেটের চোখের সামনে মার্গারেটের মুখটা ভেসে উঠলো, ওর বলা কথাগুলো। মার্গারেট বাঁচতে চেয়েছিল।

"শ্রমিকদের নৈশভোজের লোভ দিয়ে একত্রিত করেছিল ওরা। যত বেশী ক্যাজুয়ালটি, তত বেশী ক্ষতিপূরণ!" প্রফেসর ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, "তুমি একমাত্র সারভাইভার যে বেশীক্ষণ ভিতরে ছিল। তুমি জানো অপর দরজা বন্ধ ছিল। কোর্টে সাক্ষ্য দেবে না?"

চোখ দিয়ে জল গড়াতে গিয়েও থেমে গেল, কেটের চোখে আগুন। প্রফেসর বললেন, "তোমার মালিকপক্ষের হয়ে লড়ছেন এডভোকেট ম্যাক্স স্টিউয়ার, দুঁদে উকিল, দিনকে রাত করতে পারেন..." স্বয়ং শয়তান দাঁড়ালেও কেট অল্টারম্যানকে কেউ টলাতে পারবে না।

একটু থেমে, প্রফেসর আবার বললেন, "১৫৫ জন সাক্ষীকে কোর্ট ডেকেছে। ওরা সবাই বলবে দু'টি সিঁড়িই

খোলা ছিল। কিন্তু তুমি তো শুনেছ, দেখেছ সত্যিটা।”

“আমি পারবো সত্যিটা কোর্টে বলতে, দরকার হলে হাজারবার বলবো প্রফেসর,” কেট দৃঢ় কণ্ঠে বলল। কেট লড়বে, শ্রমিকদের জন্য লড়বে, অসহায় মেয়েদের জন্য লড়বে। এক সামান্য শ্রমিক নারী বদলে দেবে মার্কিন ইতিহাস, গড়ে তুলবে অর্ধেক আকাশের দাবীতে এক অভিনব অধ্যায় যা যুগে যুগে নারীকে সত্যের পথে চলার সাহস দেবে।

প্রফেসর ফ্র্যাঙ্ক সোমারও উঠে দাঁড়ালেন। জীবনে প্রথমবার ক্লাসরুমের বাইরে তাঁর আদর্শের পরীক্ষা হবে ।

(১৯১১ সালের ২৫ শে মার্চে হওয়া নিউইয়র্কের ট্রায়াঙ্গল শার্টওয়েষ্ট ফ্যাক্টরির অগ্নিকাণ্ড অবলম্বনে লেখা, যে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা গারমেন্ট ওয়ার্কার্সদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। কেট অল্টারম্যান প্রচুর চাপের কাছে নতি স্বীকার না করেও সাক্ষ্য দেন, যার ফলে মি ব্ল্যাঙ্ক আর মি হ্যারিসের শাস্তি হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাসে এই কেস বিশেষ গুরুত্ব রাখে।) ■

লেখকদের প্রতি আবেদন

আপনারা ফটো পাঠানোর সময় খেয়াল রাখুন, আমাদের যথাযথ ফটোর সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই।

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দর বনে ত্রাণ বিতরণ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রীতম পাল

ছবির নামঃ জীবন ও জীবিকা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রগুলি কেমন লাগল...

কৃষক রাজা

রিয়া মিত্র

বৃষ্টি ভিজে, রোদে পুড়ে
মাটির বুক করি কর্ষণ,
গাছের পাতায় লাগবে দোল
নামবে তাতে অঝোর বর্ষণ।
অবিরাম ফসল ফলাই
সারথি আমি কালের,
দিন-রাত চাষ করি
মালিক আমি হালের।
আমাদের হেয় করে
লাভ হবে না কোনো,
মানবজমিন উর্বর করে
মাটির কথা শোনো।। ■

'গুঞ্জন'এর ২০২১ এর বাকী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

জুন – বর্ষা বরণ সংখ্যা (কাজ চলছে)
জুলাই – রহস্য রোমাঞ্চ ও কল্প কাহিনী সংখ্যা
অগাস্ট – মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা
সেপ্টেম্বর – পুরানো দিনের কথা সংখ্যা
অক্টোবর – পূজা সংখ্যা
নভেম্বর – দীপাবলি সংখ্যা
ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা
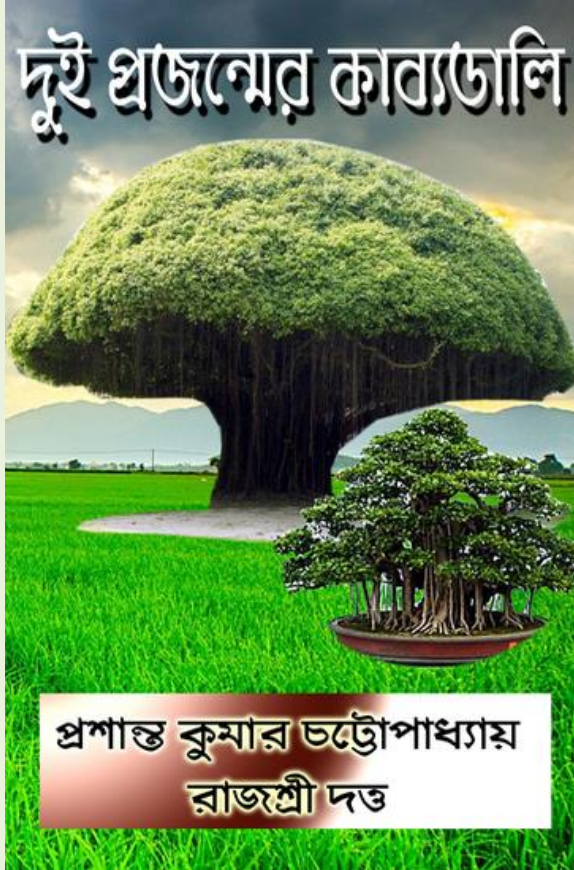
প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
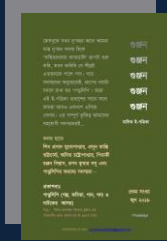
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

বিদিশার রিসার্চ পেপার

দোলা ভট্টাচার্য

আজও ফারাও এর শয়ন কক্ষ অবধি পৌঁছতে পারলেন না রাণী। ফারাও খুবই অসুস্থ। কিন্তু কি অসুখ কেউ তো বুঝিয়ে বলছে না। কি চিকিৎসা করছেন রাজবৈদ্য? সামান্য একটা চোট তিনি সারাতে পারছেন না! নাকি সারাতে চেষ্টা করছেন না! আজকাল কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। মনে হয় চারিদিকে কিসের যেন ষড়যন্ত্র চলছে। মৃত্যু যেন ওৎ পেতে রয়েছে প্রাসাদের আনাচে কানাচে। আপন কক্ষে ফিরে এলেন বিষণ্ণ রাণী। অনেকগুলো প্রশ্ন ঠেলে উঠে আসছে ভেতর থেকে। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কার কাছে পাবেন! এ কি! জাফরির ফাঁক দিয়ে কার যেন দুটি চোখ, অপলকে তাকিয়ে রয়েছে এদিকেই! কি ক্রুর দৃষ্টি এর! খাপ মুক্ত ছুরিকা হাতে ছুটে গেলেন রাণী দরজার বাইরে। কে? কে ওখানে? কই! নেইতো কেউ! লম্বা প্রশস্ত প্রাসাদের অলিন্দ। জনপ্রাণী নেই। একটা সময়ে আলোয় ঝলমল করত এই অলিন্দ। আজ দু'প্রান্তে দু'টি মাত্র দেওয়ালগিরি জ্বলছে। স্থানে স্থানে জমে রয়েছে চাপ বাঁধা অন্ধকার। বারান্দার থামগুলোর পেছনে কোন ভয়ংকরতা লুকিয়ে রয়েছে কে জানে! ওই তো, ওই থামটার পেছনেই সেদিন এক গলা কাটা প্রহরীর দেহ

পাওয়া গিয়েছিল। হঠাৎ দেওয়ালে কার যেন ছায়া দেখে শিউরে উঠলেন রাণী। কে ওখানে? নাঃ। এবারেও ভুল। নিজের ছায়াকেও ভয় লাগছে এখন। ধীর পদক্ষেপে আপন কক্ষে ফিরে এলেন রাণী। বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। ফারাও আখেনআটেন এবং রাণী নেফেরতিতির কন্যা আঙ্খেসেনামুন, অষ্টাদশ রাজবংশীয় ফারাও তুতনখামেন যার স্বামী, তার কি এরকম ভয় পাওয়ার কথা! তবু ভয় পাচ্ছেন আঙ্খেসেনামুন। প্রধান সেনাপতি হোরেমহেব এবং রাজপুরোহিত অয় এর লোভের ফাঁদে পা দিতে চাননি তিনি। তাই আজ তিনি নজর বন্দি।

তুতনখামেন-এর শয়ন কক্ষে যাবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে ওরা। ফারাও বেঁচে থাকাকালীন তাঁর রাণীর সাথে কি এরকম আচরণ করা যায়! এটাই আজ বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রধান সেনাপতি হোরেমহেবকে। বোঝাতে পারেননি রাণী। বুক কাঁপানো হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে হোরেমহেব, ওদের শর্ত না মানলে ফারাও পত্নীকে প্রাণ খোয়াতে হবে।

রাত দুটো। খাতার মধ্যে কলমটা রেখে উঠে দাঁড়ালো বিদিশা ব্যানার্জি। ইতিহাসের ছাত্রী। রিসার্চ স্কলার। মিশরের ইতিহাস ওর বিষয়। বিষয়টা যথেষ্ট জটিল এবং রহস্যের আবরণে মোড়া। বিশেষ করে অষ্টাদশ রাজবংশের ফারাও তুতনখামেনের অধ্যায়টা ভীষণ রহস্যময়।

কুজ্ঝটিকা

অষ্টাদশ রাজবংশের ফারাও, বালক তুতনখ। সূর্য দেবতা আমেনের উপাসক। তাই তুতনখ-আমেন। নিজের থেকে বয়সে সামান্য বড় আঙ্খেসেনামুনের সাথে বালক তুতনখ এর বিয়ে হয়। তারপর রাজ্যাভিষেক। অনেকেই ভেবেছিল, রাজ্যের শাসনভার এক অনভিজ্ঞ বালকের হাতে। সুতরাং যা খুশি তাই করা যাবে। কিন্তু তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে শক্ত হাতে রাজদন্ড ধারণ করেছিলেন বালক ফারাও। আঙ্খেসেনামুনের বুদ্ধি আর তুতনখএর শক্তি সাহস, ও কর্মনিপুণতা মিশরের উন্নয়নে এনেছিল এক অন্য মাত্রা। কারো কারো তাতে অসুবিধা ঘটছিল। শুরু হল ষড়যন্ত্র। ভালোবাসার আড়ালে শানিত ছুরির ঝলক কি টের পেয়েছিলেন তুতনখ! কথাটা ভাবতে ভাবতে আবার সে ডুবে যায় নিজের স্বপ্নের মধ্যে।

কি সেই শর্ত? ডাগর দুটি চোখ তুলে প্রশ্ন করে রুবেলা। দ্রুত শয্যা থেকে নেমে কক্ষের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সায়রা...। উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নেয় একঝলক। নিঃশব্দে অর্গল রুদ্ধ করে ফিরে আসে শয্যায়। ফিসফিস করে বলে, কেউ শুনতে পেলে আমাদের দুজনেরই গর্দান যাবে। ওই যে শয়তান সেনাপতি আর রাজ পুরোহিত, দুজনেই আমাদের রাণী মাকে বিয়ে করতে চাইছে। রাণী মাকে যে বিয়ে করবে, সেই তো এরপর ফারাও হবে। কিসের একটা খসখস আওয়াজ শুনে সায়রার মুখটা সবলে

চেপে ধরে রুবেলা। দুজনের চোখ বিস্ফারিত। পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে সরিসৃপটা। সাংঘাতিক বিষধর। বাইরের থেকে আসা একঝলক ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেল দেওয়ালগিরিটা। অন্ধকারে শয্যার ওপরেই মুর্ছিত হয়ে পড়ল রাজবংশীয় দুই নারী।

একবাপ কফি নিয়ে আবার নিজের চেয়ারে ফিরে আসে বিদিশা। এতক্ষণ যেন ইতিহাসের পাতার ভেতরেই হারিয়ে গিয়েছিল মনটা। কিছু ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে নিজেকে আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনে বিদিশা। নাঃ। এসব গল্পের কোনও ভিত্তি নেই। স্বপ্ন দেখে রিসার্চ পেপার তৈরি করা যায় না। প্রামাণ্য তথ্য চাই।

তুতনখামেনের মৃত্যুও রহস্যের আবরণে মোড়া। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মারা যান তুতনখামেন। কিন্তু এই মৃত্যুর কারণ কি! তাঁর সমাধি আবিস্কারের পর মমির এক্সরে করে জানা যায়, তাঁর মাথার পিছনের অংশে ছিল আঘাতের চিহ্ন। সারা শরীরের হাড়গুলোতেও ছিল ফাটল। তাই অনুমান করা হয়, হত্যা করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কারণ কি! সিংহাসনের দাবী! তুতনখামেনের পরমাসুন্দরী স্ত্রী আঙ্খেসেনামুনের অতুল রূপ আর যৌবন! আর ভাবতে পারে না বিদিশা। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দেয়

নিজেকে। এক সময়ে তলিয়ে যায় ঘুমের অতলে। রাত্রি শেষের স্বপ্নে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যায় বিদিশা।

নীলনদের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো এক হাওয়া উঠে আসছে। নিজের কক্ষে বাতায়নের পাশে বসেছিলেন বিষণ্ণ রাণী। তাকিয়েছিলেন অনেকটা দূরে, রাজন্য উপত্যকার দিকে। গোধূলির রাঙা আলোয় ভেসে যাচ্ছে উপত্যকা। দেখা যাচ্ছে কর্ম চঞ্চলতা। দূর দূরান্ত থেকে শকটে করে নিয়ে আসা হচ্ছে পাথর। তৈরি হচ্ছে পিরামিড, তুতনখ এর সমাধিগৃহ। ওরই পাশে একটুখানি জায়গায় ঠাঁই কি হবে না তুতনখএর রাণীর? দেবতা আমেনরা এর কাছে জীবনের শেষ ইচ্ছে টুকুর জন্য প্রার্থনা জানান আঙ্খেসেনামুন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আলো জ্বেলে দিতে কেউ এখনো আসেনি আজ এই ঘরে। একটু আগেই এসেছিলেন অয়। বৃদ্ধ মানুষটার দুচোখে ছিল কামনার আগুন। চকচক করে জ্বলছিল চোখদুটো। মুখে ছিল পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত হাসি। প্রসাধন করোনি কেন রাণী? আভরণবিহীন কেন তোমার সোনার বরন অঙ্গ? আলুলায়িত কেশগুচ্ছ তোমার, সুন্দর নিতম্বখানি স্পর্শ করে রয়েছে। এসো, আমি আজ কবরী বন্ধনে আবদ্ধ করে দিই তোমার কেশ।

কোমরের খাপ থেকে একটানে মুক্ত করেছিলেন সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা, ভুলে যাবেন না অয়, আমি আঙ্খেসেনামুন। আমার সব সময়ের সঙ্গী এই কোষবন্ধ ছুরিকা। আপনাকে বিদ্ধ

করতে যদি না পারি, তাহলে আমি নিজেকেই বিদ্ধ করব এই ছুরিকায়। ভয়ে ভীত কুক্কুটের মতো ছুটে চলে গিয়েছিলেন অয়। নিজের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে বুঝতে পারছিলেন রাণী। একবার, শুধু একটিবার দেখা করতে হবে ফারাওএর সঙ্গে। কার যেন করুণ কান্নার শব্দে ঘুমটা ভেঙে যায় বিদিশার। এ কি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ! কি অদ্ভুত! স্বপ্নের মধ্যেই যেন মিশরের রাজপ্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যেন টাইম মেশিনে চেপে কত সহস্র শতাব্দী পিছিয়ে গিয়েছিল ও। বিদিশা বুঝতে পারছে, এই ইতিহাসের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ছে ও। না না। আর এভাবে স্ট্রেস নেওয়া যাবে না। যেভাবেই হোক এবার শেষ করতেই হবে। আর তো মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই থিসিস সাবমিট করতে হবে। আর সামান্যই কাজ বাকি রয়েছে।

আজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল বিদিশা। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরেছে। ফ্রেশ হয়ে, সে এককাপ চা নিয়ে চেয়ারে এসে বসল। ধীরেসুস্থে চা-টা শেষ করে আবার কলমটা তুলে নিল বিদিশা। সন্ধ্যার পর এ জায়গাটা এমনিতেই শান্ত, নির্জন হয়ে পড়ে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক, তার মধ্যে লেখনীর খসখস শব্দ। ঝড়ের গতিতে লিখে চলেছে বিদিশা:—

সে রাত্রে নীলনদের বুক থেকে উঠে এসেছিল দীর্ঘশ্বাস।

কুজ্ঝটিকা

প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে এসে আছড়ে পড়েছিল সেই দীর্ঘশ্বাসবাহী সজল বাতাস, এনেছিল উনিশ বছর বয়সী তরুণ ফারাওএর মৃত্যুর সংবাদ। পৌঁছে গিয়েছিল তরুণী ফারাও পত্নীর কক্ষ পর্যন্ত। কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়েছিলেন রাণী। তবু পৌঁছতে পারেননি ফারাও-এর কক্ষে। তারপর? কোথায় গেলেন ফারাও পত্নী? ■

PREVENTION OF COVID - 19

SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels